একক ০১ ☐ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯১৯)

গঠন

০১.১ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা
০১.২ ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা
০১.৩ ১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণকারী আইন
০১.৪ উইলিয়ম পিটের ভারত শাসন আইন
০১.৫ ভারত শাসন আইন ১৮৫৮
০১.৬ ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১
০১.৭ ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৯২
০১.৮ মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন ১৯০৯
০১.৯ সারাংশ
০১.১০ অনুশীলনী
০১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

০১.১ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আমরা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে পারি। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

০১.২ ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশ ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এবং ১৭৬৪ সালে বক্সার যুদ্ধে জয়লাভের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বণিক পুঁজির অনুপ্রবেশ সুনিশ্চিত হয়। যুদ্ধের পরিণতি স্বরূপ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করার পর ব্রিটিশ বণিক পুঁজির প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে বণিক পুঁজির সঙ্গে শিল্প পুঁজির বিরোধ বাধে। পার্লামেন্টে শিল্প পুঁজির প্রতিনিধিরা প্রাধান্য অর্জন করায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যথেচ্ছভাবে ভারতকে শাসন ও শোষণ করে। কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন ক্ষমতা পার্লামেন্টের ছিল না। কেবলমাত্র মালিকদের সভা (Court of Proprietors) এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভা (Court of Directors) দ্বারা কোম্পানির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শিল্পপুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠতে থাকে। বার্ক, ফক্স, শেরিডন প্রমুখ শিল্প পুঁজির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রবক্তাগণ কোম্পানির শাসনের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই গ্রেট ব্রিটেনে ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষেত্রে সংস্কারের সূচনা হয়।

০১.৩ ১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণকারী আইন

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন প্রণীত হয়। এই আইন নিয়ন্ত্রণকারী আইন বা রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) নামে পরিচিত। এই আইন প্রণীত হওয়ায় পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে যুদ্ধের দ্বারা বা বিদেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি যে সব ভূখণ্ড অধিকার করেছে সেগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। লর্ড নর্থ প্রণীত এই নিয়ন্ত্রণ আইন বা রেগুলেটিং অ্যাক্টের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে এই আইনে বাংলা প্রেসিডেন্সির সর্বোচ্চ শাসনকর্তাকে গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট আখ্যা দেওয়া হয়। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য গভর্নর জেনারেলের পরিষদে (Council) চারজন সদস্যকে পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী গভর্নর জেনারেল কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবেন বলে ওই আইনে বলা হয়। নিয়ন্ত্রণ আইনের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও ছিল। এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পার্লামেন্ট ব্রিটিশরাজ, কোম্পানির পরিচালকসভা ও ভারতীয় প্রশাসনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পরিধি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে মত বিরোধ শাসনকার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। আইনে বলা হয়েছে যে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হবে। কিন্তু এখানেও দেখা গেল যে পরিষদের তিনজন সদস্য একজোট হয়ে গভর্নরের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং শাসনকার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

০১.৪ ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইন

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টের ত্রুটি দূর করার জন্য ১৭৮১ সালে বিচারবিভাগীয় এলাকা সংক্রান্ত আইন (Judicature Act) প্রণীত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণকারী আইনে সুপ্রিমকোর্টের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এই আইনের ফলে সেগুলি বাতিল হয়। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণকারী আইনের অন্য ত্রুটি বিচ্যুতি দর করার জন্য হুইগ নেতা চার্লস্ জেমস্ ফক্স ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল আনয়ন করেন। কিন্তু লর্ড সভায় বিলটি অগ্রাহ্য হলে লর্ড নর্থ ও ফক্সের কোয়ালিশন সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। সেই সময় ইংল্যান্ডের জনমত ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পিট নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পরেই ১৭৮৪ সালে ফক্সের ভারত শাসন আইনের অনুরূপ একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইনটির নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন ১৭৮৪। সাধারণভাবে এটি

পিটের ভারত শাসন আইন ১৭৮৪ (Pitt's India Act) নামে বিখ্যাত। পিটের ভারতশাসন আইনকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দ্বিতীয় সুদূর পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী সমগ্র ভূখণ্ডকে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল (British possession in India) বলে ঘোষণা করা হয়।

পিটের ভারতশাসন আইন কার্যত ইংল্যান্ড থেকে কোম্পানির কার্যাবলীর উপর দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। তাছাড়া এই আইন ভারতের গভর্নর জেনারেলকে অন্যান্য প্রেসিডেন্সির উপর প্রাধান্য দিয়ে কার্যত ভারতবর্ষের ঐক্য সাধনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল।

০১.৫ ভারত শাসন আইন ১৮৫৮

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ইংল্যান্ডের শাসকগোষ্ঠী দমন করতে সক্ষম হলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শিল্প পুঁজিপতিরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের বাজার রূপে দখল করার জন্য আগে থেকেই কোম্পানির উপর একের পর এক বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে কোম্পানির যে কোনও যোগাযোগ নেই এই বিদ্রোহ থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই তারা জনসংযোগহীন ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বহীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে ভারতবর্ষের মত বহুজাতি বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দেশের শাসন ক্ষমতা রাখার বিরুদ্ধে তীব্র মত পোষণ করেন। তারা ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান দাবি করেন। এর ফলে ১৮৫৮ সালে লর্ড পামারস্টোন ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল পেশ করেন। অনেক বিরোধিতার পরে শেষ পর্যন্ত বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই আইন ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত হয়।

এই আইনের মূলকথা হল ভারত শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে হস্তান্তরিত হল। ব্রিটেনের সম্রাট কোম্পানির স্থল ও নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিকর্তা হলেন। পুরাতন নিয়ন্ত্রণকারী পর্ষদকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হল। ভারতের শাসনভার একজন ভারত সচিব ও তার ভারত শাসন পরিষদের হাতে অর্পণ করা হল। ভারত শাসন ব্যাপারে ভারত সচিবকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল করে রাখা হল।

এইভাবে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটেনের শিল্পপতিরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশরাজের অধীনে আনতে সমর্থ হয়। এর ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির শোষণের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁরা ভারতবর্ষে সুশাসন প্রবর্তনের নামে কার্যত ভারতকে ব্রিটেনের শিল্প সমূহের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে রূপান্তরিত করেন।

০১.৬ ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন ১৮৬১

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানির ঘোষণায় (Royal Proclamation) উত্তরোত্তর ভারতীয়দের শাসনকার্যে সংযুক্ত করার যে কথা বলা হয়েছিল কয়েকটি ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন পাশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সে বিষয়ে কিছুটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ওই বিষয়ে প্রথমেই ১৮৬১ সালে প্রণীত ভারতীয় পরিষদ আইনের (The Indian Council Act) কথা উল্লেখ করা যায়। ওই আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল — ১৮৩৩ সালের সনদে প্রদেশগুলির যে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ১৮৬১ সালে প্রণীত আইনে মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ের সপারিষদ গভর্নরদের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পুনরায় সেই সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গভর্নর জেনারেলের হাতে নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

তাছাড়া জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য গভর্নর জেনারেলকে 'অর্ডিন্যান্স' জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয়কে যুক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় সদস্যরা আইন প্রণয়ণের ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কারণ বড়লাট কিম্বা প্রাদেশিক গভর্নরগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহের উপর আলোচনা করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না। তারা ওইসব আইনের প্রস্তাব বাতিল করতে পারতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ওইসব আইনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে এই আইনকে অন্যতম পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

১৮৮৩ সালের আইনে ভারতবর্ষে যে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, বর্তমান আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সীমাবদ্ধভাবে হলেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ফলে পূর্বনীতির পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়ত, উক্ত আইন প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার পার্থক্য নিরূপণ করে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সূত্রপাত ঘটায়।

০১.৭ ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন ১৮৯২

আগেই বলা হয়েছে ভারতে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৮৮৩ সালে পার্লামেন্টে যে আইন প্রণীত হয়েছিল তাতে শাসনপরিবদকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অর্পণ করা হয়। ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল যে এই আইনে গভর্নর জেনারেলের পরিষদে অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলা হয়। স্থির হয় যে পরিষদে ১৬ জন সদস্য থাকবে না তার মধ্যে দশজন হবেন বেসরকারি সদস্য। আবার দশজন সদস্যের মধ্যে প্রাদেশিক সরকারগুলির বেসরকারি সদস্যগণ কর্তৃক চার জন এবং বণিক সভাগুলির দ্বারা একজন নির্বাচিত হবেন। গভর্নর জেনারেলের নিকট ওইসব প্রতিনিধির নাম সুপারিশ করার পর তিনি তাদের পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। কেন্দ্রের মত প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে এক ধরনের পরোক্ষ

নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক ও শিল্পপতিদের সভা ইত্যাদির সুপারিশক্রমে গভর্নররা নিজ নিজ প্রদেশের আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের মনোনীত করবেন বলে ১৮৯২ সালের ভারতীয় আইন পরিষদ আইনে বলা হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়।

১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও কার্যত তাদের হাতে কোন ক্ষমতাই অর্পণ করা হয়নি। তাছাড়া গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের মনোমত না হলে কোনও ভারতীয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে স্থান পেতে পারেন না।

০১.৮ মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন ১৯০৯

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সারা দেশে বিশেষ করে 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের ঝড় শুরু হয় তা প্রশমিত করার জন্য ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করেন। তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর উদ্যোগে এই আইন প্রণীত হয়েছিল বলে সাধারণভাবে তা 'মর্লি' মিন্টো সংস্কার আইন বা (Morley Minto Reforms Act) নামে সুপরিচিত। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্য সংখ্যা ষোলজন থেকে বাড়িয়ে ষাট জন করা হয়। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইনপরিষদের সদস্য সংখ্যা কুড়ি থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ করা হয়। অন্যান্য প্রদেশে এই সদস্য সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ত্রিশে দাঁড়ায়।

মর্লি মিন্টো সংস্কার আইনে এ দেশে সর্বপ্রথম নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করা হয়। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও ঘোষণা করা হয়। সেজন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা (Separate Electorate System) চালু করা হয়। আইন সভাগুলির ক্ষমতাও কিছুটা পরিমাণে বাড়ানো হয়।

১৯০৯ সালের ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন বা মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন আপাতদৃষ্টিতে শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ালেও কার্যত একান্ত ব্রিটিশভক্ত নরমপন্থীরাই এই সুযোগ লাভ করতেন। চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের সুকৌশলে এই সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত রীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তথাকথিত সংস্কার সাধনের নামে এই আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। লর্ড মিন্টো দ্বিজাতি তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পৃথক ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইভাবে মর্লি মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয় তা কালক্রমে মহীরুহের আকার ধারণ করে ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেয় এবং পরিণামে ভারতবিভাগের পথ প্রশস্ত করে।

০১.৯ সারাংশ

ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাঁদের রাজনৈতিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বণিক পুঁজির ওপর শিল্প পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে।

এই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয় যেখানে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে 'গভর্নর জেনারেল'-এর পদ সৃষ্টি করা হয়, এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু নানা কারণে এই আইন প্রশাসনিক কার্যকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারেনি।

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য ১৭৮১ সালে 'বিচার-বিভাগীয় এলাকা সংক্রান্ত আইন' প্রণীত হলেও এই আইনের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। 'পিটের ভারত শাসন আইন (১৭৮৪)' কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত ভূখণ্ডকে সর্বপ্রথম ভারতে ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে এবং কোম্পানির কার্যাবলীর ওপর ইংল্যান্ড থেকে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছিল।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮৫৮ সালে প্রণীত 'ভারত শাসন আইন'-এ কোম্পানির হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হাতে তুলে দেওয়া হল এবং ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হল একজন ভারতসচিব এবং তার ভারত শাসন পরিষদের হাতে।

১৮৬১ সালে প্রণীত 'ভারতীয় পরিষদ আইন'-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয়কে সংযুক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় সদস্যরা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি। তবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে এই আইনের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ১৮৯২ সালের 'ভারতীয় পরিষদ আইন'-এ। কিন্তু বাস্তবে তাদের হাতে কোন ক্ষমতাই অর্পণ করা হয়নি। ১৯০৯ সালের 'মর্লি মিণ্টো সংস্কার আইন' ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সম্প্রদায়-ভিত্তিক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করে এবং পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা চালু করে। আপাতদৃষ্টিতে শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ালেও এই আইনের সুবিধা ভোগ করতেন ব্রিটিশভক্ত নরমপন্থীরা। তাছাড়াও এই আইন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল।

০১.১০ অনুশীলনী

১। ১৮৫৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবস্থা বর্ণনা করুন।

২। উইলিয়ম পিটের ভারতশাসন আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩। মহারানির ঘোষণা পত্রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ক্ষোভ প্রশমনের জন্য কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল?

৪। ১৮৬১ ও ১৮৯২ সালের সংস্কার আইনে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর অংশগ্রহণের সুযোগ কতটা সম্প্রসারিত হয়েছিল?

৫। ১৯১৯ সালের মর্লি মিন্টো সংস্কারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

০১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Introduction to the Constitution of India — *Dr. Durgadas Basu*, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi.

(২) ঐ—অনুবাদ ভারতের সংবিধান পরিচয় — *রমেন্দ্র মজুমদার*।

(৩) ভারতের শাসনব্যবস্থার পরিচয় — *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তি ঘোষ*।

(৪) ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি — *অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।*

একক ০২ ❐ ১৯১৯ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

গঠন

০২.১ উদ্দেশ্য
০২.২ প্রস্তাবনা
০২.৩ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি
০২.৪ ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
০২.৫ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি
০২.৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন
০২.৭ ১৯৪৬ সালের গণপরিষদের নির্বাচন
০২.৮ ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীন ভারতের সূচনা (১৯৪৭)
০২.৯ সারাংশ
০২.১০ অনুশীলনী
০২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

০২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে কীভাবে ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কার থেকে, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর, গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন এবং স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে সেই সাংবিধানিক ইতিহাসের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন।

ভারতবর্ষে সাংবিধানিক শাসনের যে ঐতিহ্য প্রবর্তিত হয়েছে তার গোড়াপত্তন হয় ঔপনিবেশিক আমলের শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলির মধ্য দিয়ে। বস্তুত বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের বেশ কিছু উপাদানের ওপর ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ছায়া পড়েছে অনেকটাই। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ অধ্যয়নে এই এককটি সহায়ক হবে।

০২.২ প্রস্তাবনা

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের জনগণকে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে সংযুক্ত করা এবং ভারতের দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই হল ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্য। প্রস্তাবিত আইনের প্রবর্তন, প্রয়োগ ও ব্যর্থতা জনিত অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতরাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যায়। সেই অগ্রগমনের ফলশ্রুতি ১৯৩৫

সালের ভারতশাসন আইন ও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের নির্বাচন; ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ও স্বাধীনতার সূচনা, গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন ও ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ভারতের গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে।

০২.৩ ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের পটভূমি

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ বলে ঘোষিত হলেও দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এতে স্তিমিত হয়নি। সেই সঙ্গে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে থাকে। গান্ধিজি অবশ্য মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্য করার আহ্বান জানান এবং পরোক্ষভাবে তাদের সাহায্য করেন। যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্না, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। ওই স্মারকলিপিতে (Memorandum) তারা ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনকে 'অসমাপ্ত' বলে বর্ণনা করেন। কারণ ওই আইনে ভারতীয়দের কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। তারা সু-সরকার (good government) কিংবা সুদক্ষ প্রশাসন চান না তা নয়। কিন্তু আবেদনকারীরা এমন একটি সরকার চান যে সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন। ওই একই বছরের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুক্তভাবে স্বায়ত্তশাসন মূলক রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানায়। এই দাবিটিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সরকারের কাছে সংস্কার বিষয়ে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা (Scheme) পেশ করা হয়। এই সময় লর্ড মন্টেগু ভারতসচিব হন। তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন ১৯১৭ সালে। ১৯১৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভারতের ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভারতের জন্য একটি শাসন সংস্কার মূলক রিপোর্ট তৈরি করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পাশ হয়।

০২.৪ ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার বদলে ব্রিটেনের রাজস্ব তহবিল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের জন্য একজন হাইকমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই নতুন আইনে কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুটি কক্ষ হলো কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (Central Legislative Assembly) এবং রাজ্য পরিষদ (Council of States)। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মেয়াদ হল তিন বছর। কিন্তু রাজ্য পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের ব্যাপারে নাগরিক অধিকার কমিটি (Franchise Committee) পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সুপারিশ করলেও সরকার উভয় কক্ষের জন্য

প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন করে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হলেও সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিই ভোটাধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়। কারণ ভোটদাতাদের যোগ্যতার উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় আইন সভার ক্ষমতা অনেক খর্ব করা হয়। ১৯১৯ সালের আইনে প্রথম ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক বিষয়গুলিকে দুটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা কেন্দ্রীয় তালিকা ও প্রাদেশিক তালিকা। প্রাদেশিক আইন সভাগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়।

ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন (Provincial Dyarchy) প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সংরক্ষিত বিষয় (Reserved Subjects) এবং হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects)। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপর থাকত। সংরক্ষিত বিষয়গুলির দেখাশোনা গভর্নর করতেন। গভর্নর নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে গণ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি প্রধান ও প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীরা জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হতেন।

০২.৫ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি

১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কার আইন প্রণীত হওয়ার পরেও সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীনিবাস আয়েংগার, জওহরলাল নেহরু প্রমুখের নেতৃত্বে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য 'স্বাধীনতা সংঘ' (Independence League) গঠন করেন। তাদের চেষ্টাতেই ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পর ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধিজীর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পর পর এই সব নানা ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ 'শ্বেতপত্র' (White Paper) নামে এক দলিলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা (Dyarchy) এবং প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ওই শ্বেতপত্রের প্রস্তাব বিচার বিবেচনার জন্য একটি যৌথ মনোনয়ন কমিটি (Joint Select Committee) গঠিত হয়। ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড লিন্‌লিথগো। ওই কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বর তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর একটি বিল উত্থাপন করেন। ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট ওই বিল ব্রিটিশ রাজার সম্মতি (Royal Consent) লাভের পর আইনে পরিণত হয়। ওই আইনই ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ (The Government of India Act 1935) নামে পরিচিত।

০২.৬ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব। এই আইন অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্য এই দুভাগে ভাগ করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে এগারোটি করা হয়। ব্রিটিশ ভারত বলে কথিত ওই ১১টি প্রদেশকে আবশ্যিকভাবে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। বলা হয় যে কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যকে 'যোগদান সম্পর্কিত দলিল'-এ (Instrument of Accession) স্বাক্ষর করতে হবে। ওই দলিলে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার পর ওই রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় নীতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছিল। তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি কেউই গ্রহণ করেনি।

০২.৭ ১৯৪৬ সালের গণপরিষদের নির্বাচন

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করেছেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে সারা দেশ জুড়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছে। ক্রিপ্‌স্ মিশন ভারতবর্ষে এসেছে। মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি করেছে। যুদ্ধান্তে ভারতের রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনীতি ও সাংবিধানিক বিকাশের ক্ষেত্রে এনেছে সুদূরপ্রসারী গুণগত পরিবর্তন।

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গণপরিষদের প্রতিষ্ঠাকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেদিন থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে সেদিন থেকেই ভারতের সংবিধান রচনায় ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপিত হয়েছে। ১৯২২ সালে গান্ধিজি এই দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতবাসীর জন্য সংবিধান রচনার দাবি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই সুস্পষ্টভাবে তোলা হয়। এদিকে আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যর্থতার পর ১৯৩৪ সালের মে মাসে কংগ্রেস নরমপন্থীরা (Moderates) আইন সভায় প্রবেশ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান রচনার দাবি জানায়। ১৯৩৬ সালের ২৯ শে জুলাই কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে গণপরিষদ গঠনের সপক্ষে জোরালো দাবি উত্থাপন করে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে গণপরিষদ গঠনের দাবি জোরালো আকার ধারণ করলে ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট ভাইস্‌রয় তার বিখ্যাত আগস্ট ঘোষণায় (August Declaration) সর্বপ্রথম স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা একান্তভাবেই ভারতীয়দের নিজস্ব ব্যাপার।

এরপর ক্রিপস্ মিশন প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটার পর সর্বশ্রেণির ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। এর পর ১৯৪৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার একটি গণপরিষদ আহ্বান করবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। তিনি প্রস্তাবিত সংবিধান রচনার ব্যাপারে ভারতীয় ঐকমত্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভারতে আগত ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৪৬ সালে সারাভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মোট ১৮৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস একাই ৯২৫টি অর্থাৎ ৫৮% আসন অধিকার করে। এই নির্বাচনের পর ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ভারতের গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণপরিষদের মোট ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৩টি আসনে জয়লাভ করে। এছাড়া গণপরিষদে কংগ্রেস ৪ জন মুসলমান ও ১ জন শিখ প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। ফলে গণপরিষদের মোট ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ২০৮ জন। এইভাবে গণপরিষদ কার্যত কংগ্রেস পরিষদে রূপান্তরিত হয়।

০২.৮ ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীনতা লাভের সূচনা

ক্ষমতার হস্তান্তর ও 'ডোমিনিয়ন ভারত'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। এই অধিবেশনে ইউনিয়ন-এর ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটির (Union Powers Committee) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষমতা বিষয়ক রিপোর্ট, সংখ্যালঘু পরামর্শদাতা কমিটির রিপোর্ট এবং সংবিধান রচনাকারী ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে গণপরিষদের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শেষোক্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে গণপরিষদ সংবিধান রচনা এবং আইন প্রণয়ন উভয় কার্যই করবে।

বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে ২৯শে আগস্ট ১৯৪৭-এ একটি মুসাবিদা কমিটি (Drafting Committee) গঠিত হয়। ডঃ বি. আর আম্বেদকর ওই কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটির আড়াই বছরের প্রচেষ্টার ফলে ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম, লিখিত গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি হয়।

০২.৯ সারাংশ

ভারতবর্ষে শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ১৯১৯ সালের 'ভারত শাসন আইন' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই

আইন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছিল, যেমন — ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশের রাজস্ব তহবিল থেকে প্রদান, গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে একজন হাইকমিশনার নিয়োগ, কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রশাসনিক বিষয়গুলিকে দুটি তালিকায় বিভক্তিকরণ ইত্যাদি।

কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন, গান্ধিজির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার 'শ্বেতপত্র' দলিলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা এবং প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন যেটির বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব পড়ে একটি 'যৌথ মনোনয়ন কমিটি'-র ওপর। এই কমিটির রিপোর্টের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন' প্রবর্তিত হয়। এই আইনে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বন্টন, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি কেউই গ্রহণ করেনি।

গণপরিষদের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সংবিধান রচনায় ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট তৎকালীন ভাইসরয় তাঁর বিখ্যাত 'আগস্ট ঘোষণা'য় ভারতীয়দের নিজস্ব সংবিধান রচনার বিষয়টিকে সমর্থন জানান। এরপর ক্রিপস্ মিশন সুপারিশ, ওয়াভেল পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গণপরিষদ গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে বিভিন্ন কমিটি রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার ওপর ভিত্তি করে ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় একটি কমিটির ওপর যার আড়াই বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম, লিখিত, গণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি হয়।

০২.১০ অনুশীলনী

১। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের রাজনৈতিক পটভূমি কী ছিল?

২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

৩। কী পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

৪। ১৯৪৬ সালে ভারতে গণপরিষদ নির্বাচনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৫। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ও স্বাধীন ভারতের সূচনা পর্বের উপর এক সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

০২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Social Background of Indian Nationalism - *A. R. Desai.*

(২) Introduction to the Constitution of India - *Dr. Durgadas Basu.*

(৩) ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি — *অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।*

সংবিধানের খসড়া গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত হয়। এই গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল প্রাদেশিক আইনসভা গুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। 299 জন নির্বাচিত প্রতিনিধি (389 জন, দেশভাগের পূর্বে) 2 বছর 11 মাস এবং 18 দিনে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন।

ডক্টর আম্বেদকর সংবিধানের পিতা নামে পরিচিত।

6 Dec 1946 গণপরিষদ গঠিত হয়।

9 Dec 1946 গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

11 Dec 1946 ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কে সভাপতি, এইচসি মুখার্জি কে সহ-সভাপতি এবং বি এন রাও কে সাংবিধানিক আইনের পরামর্শদাতা হিসাবে মনোনীত করা হয়। (প্রাথমিকভাবে সভায় 389 জন প্রতিনিধি ছিলেন যা দেশভাগের পরে হ্রাস পেয়ে 299 হয়। এই 389 জন প্রতিনিধির মধ্যে 292 জন ছিলেন প্রাদেশিক আইন সভা থেকে, চারজন মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ থেকে এবং বাকি 93 জন ছিলেন দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে)।

13 Dec 1946 নেহেরু সংবিধানের মৌলিক নীতি সম্পর্কিত "উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব" গণপরিষদে পেশ করেন যা পরে সংবিধানের প্রস্তাবনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

22 Jan 1947 উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গণপরিষদে গৃহীত হয়।

22 Jan 1947 জাতীয় পতাকা গৃহীত হয়।

15 Aug 1947 স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশভাগ এবং স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের গঠন।

29 Aug 1947 খসড়া কমিটি আম্বেদকর কে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করে।

26 Nov 1949 ভারতের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। সংবিধান একটি প্রস্তাবনা, 395 টি অধ্যায়, 8 টি তপশিলি এবং 22 টি ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে যা বেড়ে হয়েছে 448 টি অধ্যায় বারোটি তপশিলি এবং 25 টি ভাগ।

26 Jan 1950 সংবিধান কার্যকরী হয়।